আল মাউন

১০৭

নামকরণ

শেষ আয়াতের শেষ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে যুবাইরের (রা) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তাঁরা এ সূরাকে মক্কী হিসেবে গণ্য করেছেন। আতা ও জাবেরও এ একই উক্তি করেছেন। কিন্তু আবু হাইয়ান বাহরুল মুহীত গ্রন্থে ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যাহ্হাকের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এটি মাদানী সূরা। আমাদের মতে, এই সূরার মধ্যে এমন একটি আভ্যন্তরীণ সাক্ষ রয়েছে যা এর মাদানী হবার প্রমাণ পেশ করে। সেটি হচ্ছে, এ সূরায় এমন সব নামাযীদেরকে ধ্বংসের বার্তা শুনানো হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে গাফলতি করে এবং লোক দেখানো নামায পড়ে। এ ধরনের মুনাফিক মদীনায় পাওয়া যেতো। কারণ ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীরা সেখানে এমন পর্যায়ের শক্তি অর্জন করেছিল, যার ফলে বহু লোককে পরিস্থিতির তাগিদে ঈমান আনতে হয়েছিল এবং তাদের বাধ্য হয়ে মসজিদে আসতে হতো। তারা নামাযের জামায়াতে শরীক হতো এবং লোক দেখানো নামায পড়তো। এভাবে তারা মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হতে চাইতো। বিপরীতপক্ষে মক্কায় লোক দেখাবার জন্য নামায পড়ার মতো কোন পরিবেশই ছিল না। সেখানে তো ঈমানদারদের জন্য জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা করাই দুরূহ ছিল। গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নামায পড়তে হতো। কেউ প্রকাশ্যে নামায পড়লে ভয়ানক সাহসিকতার পরিচয় দিতো। তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকতো। সেখানে যে ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতে তারা লোক দেখানো ঈমান আনা বা লোক দেখানো নামায পড়ার দলভুক্ত ছিল না। বরং তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী হবার ব্যাপারটি জেনে নিয়েছিল এবং মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের কেউ কেউ নিজের শাসন ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব বহাল রাখার জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে পিছপাও হচ্ছিল। আবার কেউ কেউ নিজেদের চোখের সামনে মুসলমানদেরকে যেসব বিপদ–মুসিবতের মধ্যে ঘেরাও দেখছিল ইসলাম গ্রহণ করে নিজেরাও তার মধ্যে ঘেরাও হবার বিপদ কিনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। সূরা আনকাবুতের ১০–১১ আয়াতে মক্কী যুগের মুনাফিকদের এ অবস্থাটি বর্ণিত হয়েছে। (আরো জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আল আনকাবুত ১৩–১৬ টীকা)

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আখেরাতের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের মধ্যে কোন্ ধরনের নৈতিকতা জন্ম নেয় তা বর্ণনা করাই এর মূল বিষয়বস্তু। ২ ও ৩ আয়াতে এমনসব কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা প্রকাশ্যে আখেরাতকে মিথ্যা বলে। আর শেষ চার আয়াতে যেসব মুনাফিক আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান মনে হয় কিন্তু যাদের মনে আখেরাত এবং তার শাস্তি–পুরস্কার ও পাপ–পূণ্যের কোন ধারণা নেই, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আখেরাত বিশ্বাস ছাড়া মানুষের মধ্যে একটি মজবুত শক্তিশালী ও পবিত্র–পরিচ্ছন্ন চরিত্র গড়ে তোলা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, এ সত্যটি মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়াই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে উভয় ধরনের দলের কার্যধারা বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য।

أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ① فَذٰلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ② وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ③ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ④ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑤ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ⑥ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ⑦

তুমি কি তাকে দেখেছো[১] যে আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে[২] মিথ্যা বলছে?[৩] সে-ই তো[৪] এতিমকে ধাক্কা দেয়[৫] এবং মিসকিনকে খাবার দিতে[৬] উদ্বুদ্ধ করে না।[৭] তারপর সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস,[৮] যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে,[৯] যারা লোক দেখানো কাজ করে[১০] এবং মামুলি প্রয়োজনের জিনিসপাতি[১১] (লোকদেরকে) দিতে বিরত থাকে।

১. 'তুমি কি দেখেছো' বাক্যে এখানে বাহ্যত সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনাভংগী অনুযায়ী দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন লোকদেরকেই এ সম্বোধন করা হয়ে থাকে। আর দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখাও হয়। কারণ সামনের দিকে লোকদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে। আবার এর মানে জানা, বুঝা ও চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে। আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায়ও এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, "আচ্ছা, ব্যাপারটা আমাকে দেখতে হবে।" অর্থৎ আমাকে জানতে হবে। অথবা আমরা বলি, "এ দিকটাও তো একবার দেখো।" এর অর্থ হয়, "এ দিকটা সম্পর্কে একটু চিন্তা করো।" কাজেই "আরাআইতা" (اَرَءَيْتَ) শব্দটিকে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করলে আয়াতের অর্থ হবে, "তুমি কি জানো সে কেমন লোক যে শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা বলে?" অথবা "তুমি কি ভেবে দেখেছো সেই ব্যক্তির অবস্থা যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে?"

২. আসলে বলা হয়েছে : يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ । কুরআনের পরিভাষায় "আদ্‌ দীন" শব্দটি থেকে আখেরাতে কর্মফল দান বুঝায়। দীন ইসলাম অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু

সামনের দিকে যে বিষয়ের আলোচনা হয়েছে তার সাথে প্রথম অর্থটিই বেশী খাপ খায় যদিও বক্তব্যের ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে দ্বিতীয় অর্থটিও খাপছাড়া নয়। ইবনে আব্বাস (রা) দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ তাফসীরকার প্রথম অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে সমগ্র সূরার বক্তব্যের অর্থ হবে, আখেরাত অস্বীকারের আকীদা মানুষের মধ্যে এ ধরনের চরিত্র ও আচরণের জন্ম দেয়। আর দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে দীন ইসলামের নৈতিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট করাটাই সমগ্র সূরাটির মূল বক্তব্যে পরিণত হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের অর্থ হবে, এ দীন অস্বীকারকারীদের মধ্যে যে চরিত্র ও আচরণ বিধি পাওয়া যায় ইসলাম তার বিপরীত চরিত্র সৃষ্টি করতে চায়।

৩. বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে মনে হয়, এখানে এ প্রশ্ন দিয়ে কথা শুরু করার উদ্দেশ্য একথা জিজ্ঞেস করা নয় যে, তুমি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো কি না। বরং আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কার অস্বীকার করার মনোবৃত্তি মানুষের মধ্যে কোন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করে শ্রোতাকে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এই সংগে কোন্ ধরনের লোকেরা এ আকীদাকে মিথ্যা বলে সে কথা জানার আগ্রহ তার মধ্যে সৃষ্টি করাই এর লক্ষ। এভাবে সে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার নৈতিক গুরুত্ব বুঝার চেষ্টা করবে।

৪. আসলে فَذٰلِكَ الَّذِىْ বলা হয়েছে। এ বাক্যে "فَ" অক্ষরটি একটি সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ পেশ করছে। এর মানে হচ্ছে, "যদি তুমি না জেনে থাকো তাহলে তুমি জেনে নাও," "সে-ই তো সেই ব্যক্তি" অথবা এটি এ অর্থে যে, "নিজের এ আখেরাত অস্বীকারের কারণে সে এমন এক ব্যক্তি যে ...."

৫. মূলে يَدُعُّ الْيَتِيْمَ বলা হয়েছে এর কয়েকটি অর্থ হয়। এক, সে এতিমের হক মেরে খায় এবং তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বেদখল করে তাকে সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। দুই, এতিম যদি তার কাছে সাহায্য চাইতে আসে তাহলে দয়া করার পরিবর্তে সে তাকে ধিক্কার দেয়। তারপরও যদি সে নিজের অসহায় ও কষ্টকর অবস্থার জন্য অনুগ্রহ লাভের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। তিন, সে এতিমের ওপর জুলুম করে। যেমন তার ঘরেই যদি তার কোন আত্মীয় এতিম থাকে তাহলে সারাটা বাড়ির ও বাড়ির লোকদের সেবা যত্ন করা এবং কথায় কথায় গালমন্দ ও লাথি ঝাঁটা খাওয়া ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না। তাছাড়া এ বাক্যের মধ্যে এ অর্থও নিহিত রয়েছে যে, সেই ব্যক্তি মাঝে মাঝে কখনো কখনো এ ধরনের জুলুম করে না বরং এটা তার অভ্যাস ও চিরাচরিত রীতি সে যে এটা একটা খারাপ কাজ করছে, এ অনুভূতিও তার থাকে না। বরং বড়ই নিশ্চিন্তে সে এ নীতি অবলম্বন করে যেতে থাকে। সে মনে করে, এতিম একটা অক্ষম ও অসহায় জীব। কাজেই তার হক মেরে নিলে, তার ওপর জুলুম-নির্যাতন চালালে অথবা সে সাহায্য চাইতে এলে তাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিলে কোন ক্ষতি নেই।

এ প্রসংগে কাজী আবুল হাসান আল মাওয়ারদী তাঁর "আলামূন নুবুওয়াহ" কিতাবে একটি অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে ঃ আবু জেহেল ছিল একটি এতিম ছেলের অভিভাবক। ছেলেটি একদিন তার কাছে এলো। তার গায়ে একটুকরা কাপড়ও ছিল না। সে কাকুতি মিনতি করে তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাকে কিছু দিতে

বললো। কিন্তু জালেম আবু জেহেল তার কথায় কানই দিল না। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর শেষে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। কুরাইশ সরদাররা দুষ্টুমি করে বললো, "যা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে চলে যা। সেখানে গিয়ে তার কাছে নালিশ কর। সে আবু জেহেলের কাছে সুপারিশ করে তোর সম্পদ তোকে দেবার ব্যবস্থা করবে।" ছেলেটি জানতো না আবু জেহেলের সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি সম্পর্ক এবং এ শয়তানরা তাকে কেন এ পরামর্শ দিচ্ছে। সে সোজা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে গেলো এবং নিজের অবস্থা তাঁর কাছে বর্ণনা করলো। তার ঘটনা শুনে নবী (সা) তখনই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকে সংগে নিয়ে নিজের নিকৃষ্টতম শত্রু আবু জেহেলের কাছে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে আবু জেহেল তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। তারপর যখন তিনি বললেন, এ ছেলেটির হক একে ফিরিয়ে দাও তখন সে সংগে সংগেই তাঁর কথা মেনে নিল এবং তার ধন-সম্পদ এনে তার সামনে রেখে দিল। ঘটনার পরিণতি কি হয় এবং পানি কোন্ দিকে গড়ায় তা দেখার জন্য কুরাইশ সরদাররা ওঁৎ পেতে বসেছিল। তারা আশা করছিল দু'জনের মধ্যে বেশ একটা মজার কলহ জমে উঠবে। কিন্তু এ অবস্থা দেখে তারা অবাক হয়ে গেলো। তারা আবু জেহেলের কাছে এসে তাকে ধিক্কার দিতে লাগলো। তাকে বলতে লাগলো, তুমিও নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছো। আবু জেহেল জবাব দিল, আল্লাহর কসম। আমি নিজের ধর্ম ত্যাগ করিনি। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডাইনে ও বাঁয়ে এক একটি অস্ত্র রয়েছে। আমি তার ইচ্ছার সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ করলে সেগুলো সাজা আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে যাবে। এ ঘটনাটি থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় না যে, সে যুগে আরবের সবচেয়ে বেশী উন্নত ও মর্যাদাশালী গোত্রের বড় বড় সরদাররা পর্যন্ত এতিম ও সহায়-সম্বলহীন লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতো বরং এই সংগে একথাও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুদের ওপরও তাঁর এ চারিত্রিক প্রভাব কতটুকু কার্যকর হয়েছিল। ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আম্বিয়া ৫ টীকায় আমি এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে জবরদস্ত নৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে কুরাইশরা তাঁকে যাদুকর বলতো এ ঘটনাটি তারই মূর্ত প্রকাশ।

৬. اِطْعَامِ الْمِسْكِيْنِ নয় বরং طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ বলা হয়েছে "ইত্'আমুল মিসকিন" বললে অর্থ হতো," সে মিসকিনকে খানা খাওয়াবার ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। কিন্তু "তাআমুল মিসকিন" বলায় এর অর্থ দাঁড়িয়েছে, "সে মিসকিনকে খানা দিতে উৎ-সাহিত করে না।" অন্য কথায়, মিসকিনকে যে খাবার দেয়া হয় তা দাতার খাবার নয় বরং ঐ মিসকিনেরই খাবার। তা ঐ মিসকিনের হক এবং দাতার ওপর এ হক আদায় করার দায়িত্ব বর্তায়। কাজেই দাতা এটা মিসকিনকে দান করছে না বরং তার হক আদায় করছে। সূরা আয্ যারিয়াতের ১৯ আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ "আর তাদের ধন সম্পদে রয়েছে ভিখারী ও বঞ্চিতদের হক।"

৭. لَا يَحُضُّ শব্দের মানে হচ্ছে, সে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না যে, সমাজে যেসব গরীব ও অভাবী লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে তাদের হক আদায় করো এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কিছু করো।

এখানে মহান আল্লাহ শুধুমাত্র দু'টি সুস্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে আসলে আখেরাত অস্বীকার প্রবণতা মানুষের মধ্যে কোন্ ধরনের নৈতিক অসৎবৃত্তির জন্ম দেয় তা বর্ণনা করেছেন। আখেরাত না মানলে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ না করার মতো দু'টো দোষ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় বলে শুধুমাত্র এ দু'টি ব্যাপারে মানুষকে পাকড়াও ও সমালোচনা করাই এর আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং এই গোমরাহীর ফলে যে অসংখ্য দোষ ও ত্রুটির জন্ম হয় তার মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ এমন দু'টি দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেক সুস্থ বিবেক ও সৎবিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যেগুলোকে নিকৃষ্টতম দোষ বলে মেনে নেবে। এই সংগে একথাও হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়াই উদ্দেশ্য যে, এ ব্যক্তিটিই যদি আল্লাহর সামনে নিজের উপস্থিতি ও নিজের কৃতকর্মের জবাবদিহির স্বীকৃতি দিতো, তাহলে এতিমের হক মেরে নেবার, তার ওপর জুলুম-নির্যাতন করার, তাকে ধিক্কার দেবার এবং মিসকিনকে নিজে খাবার না দেবার ও অন্যকে দিতে উদ্বুদ্ধ না করার মতো নিকৃষ্টতম কাজ সে করতো না। আখেরাত বিশ্বাসীদের গুণাবলী সূরা আসর ও সূরা বালাদে বয়ান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা করার জন্য তারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় এবং وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ তারা পরস্পরকে সত্যপ্রীতি ও অধিকার আদায়ের উপদেশ দেয়।

৮. এখানে শব্দ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে "ফা" (ف) ব্যবহার করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রকাশ্যে যারা আখেরাত অস্বীকার করে তাদের অবস্থা তুমি এখনই শুনলে, এখন যারা নামায পড়ে অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে শামিল মুনাফিকদের অবস্থাটা একবার দেখো। তারা যেহেতু বাহ্যত মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আখেরাতকে মিথ্যা মনে করে, তাই দেখো তারা নিজেদের জন্য কেমন ধ্বংসের সরঞ্জাম তৈরি করছে।

"মুসাল্লীন" মানে নামায পাঠকারীগণ। কিন্তু যে আলোচনা প্রসংগে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সামনের দিকে তাদের যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষিতে এ শব্দটির মানে আসলে নামাযী নয় বরং নামায আদায়কারী দল অর্থাৎ মুসলমানদের দলের অন্তরভুক্ত হওয়া।

৯. فِى صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ যদি বলা হতো "ফী সালাতিহিম" তাহলে এর মানে হতো, নিজের নামাযে ভুলে যায়। কিন্তু নামায পড়তে পড়তে ভুলে যাওয়া ইসলামী শরীয়াতে নিফাক তো দূরের কথা গোনাহের পর্যায়েও পড়ে না। বরং এটা আদতে কোন দোষ বা পাকড়াও যোগ্য কোন অপরাধও নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজেরও নামাযের মধ্যে কখনো ভুল হয়েছে। তিনি এই ভুল সংশোধনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। এর বিপরীতে

عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ মানে হচ্ছে, তারা নিজেদের নামাযের থেকে গাফেল। নামায পড়া ও না পড়া উভয়টিরই তাদের দৃষ্টিতে কোন গুরুত্ব নেই। কখনো তারা নামায পড়ে আবার কখনো পড়ে না। যখন পড়ে, নামাযের আসল সময় থেকে পিছিয়ে যায় এবং সময় যখন একেবারে শেষ হয়ে আসে তখন উঠে গিয়ে চারটে ঠোকর দিয়ে আসে। অথবা নামাযের জন্য ওঠে ঠিকই কিন্তু একেবারে যেন উঠতে মন চায়না এমনভাবে ওঠে এবং নামায পড়ে নেয় কিন্তু মনের দিক থেকে কোন সাড়া পায় না। যেন কোন আপদ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নামায পড়তে পড়তে কাপড় নিয়ে খেলা করতে থাকে। হাই তুলতে থাকে। আল্লাহর স্মরণ সামান্যতম তাদের মধ্যে থাকে না। সারাটা নামাযের মধ্যে তাদের এ অনুভূতি থাকে না যে, তারা নামায পড়ছে। নামাযের মধ্যে কি পড়ছে তাও তাদের খেয়াল থাকে না নামায পড়তে থাকে এবং মন অন্যত্র পড়ে থাকে। তাড়াহুড়া করে এমনভাবে নামাযটা পড়ে নেয় যাতে কিয়াম, রুকূ ও সিজদা কোনটাই ঠিক হয় না। কোননা কোন প্রকারে নামায পড়ার ভান করে দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করে। আবার এমন অনেক লোক আছে, যারা কোন জায়গায় আটকা পড়ে যাবার কারণে বেকায়দায় পড়ে নামাযটা পড়ে নেয় কিন্তু আসলে তাদের জীবনে এ ইবাদাতটার কোন মর্যাদা নেই। নামাযের সময় এসে গেলে এটা যে নামাযের সময় এ অনুভূতিটাও তাদের থাকে না। মুয়ায্যিনের আওয়াজ কানে এলে তিনি কিসের আহবান জানাচ্ছেন, কাকে এবং কেন জানাচ্ছেন একথাটা একবারও তারা চিন্তা করে না। এটাই আখেরাতের প্রতি ঈমান না থাকার আলামত। কারণ ইসলামের এ তথাকথিত দাবীদাররা নামায পড়লে কোন পুরস্কার পাবে বলে মনে করে না এবং না পড়লে তাদের কপালে শাস্তি ভোগ আছে একথা বিশ্বাস করে না। এ কারণে তারা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। এ জন্য হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ও হযরত আতা ইবনে দীনার বলেন ঃ আল্লাহর শোকর তিনি "ফী সালাতিহিম সাহুন" বলেননি বরং বলেছেন, "আন সালাতিহিম সাহুন।" অর্থাৎ আমরা নামাযে ভুল করি ঠিকই কিন্তু নামায থেকে গাফেল হই না। এ জন্য আমরা মুনাফিকদের অন্তরভুক্ত হবো না।

কুরআন মজীদের অন্যত্র মুনাফিকদের এ অবস্থাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ

"তারা যখনই নামাযে আসে অবসাদগ্রস্তের মতো আসে এবং যখনই (আল্লাহর পথে) খরচ করে অনিচ্ছাকৃতভাবে করে।" (তাওবা ৫৪)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

تِلْكَ صلوة المنافق ، تلك صلوة المنافق ، تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقراربعا لايذكر الله فيها الا قليلا –

"এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে আসরের সময় বসে সূর্য দেখতে থাকে। এমনকি সেটা শয়তানের দু'টো শিংয়ের

মাঝখানে পৌঁছে যায়। (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়) তখন সে উঠে চারটে ঠোকর মেরে নেয়। তাতে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করা হয়।" বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে তাঁর পুত্র মুসআব ইবনে সা'দ রেওয়ায়াত করেন, যারা নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে তাদের সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, যারা গড়িমসি করতে করতে নামাযের সময় শেষ হয় হয় এমন অবস্থায় নামায পড়ে তারাই হচ্ছে এসব লোক। (ইবনে জারীর, আবু ইয়ালা, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান। এ রেওয়ায়াতটি হযরত সা'দের নিজের উক্তি হিসেবেও উল্লেখিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এর সনদ বেশী শক্তিশালী। আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হিসেবে এ রেওয়ায়াতটির সনদ বাইহাকী ও হাকেমের দৃষ্টিতে দুর্বল) হযরত মুস'আবের দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি হচ্ছে, তিনি নিজের মহান পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, এ আয়াতটি নিয়ে কি আপনি চিন্তা–ভাবনা করেছেন? এর অর্থ কি নামায ত্যাগ করা? অথবা এর অর্থ নামায পড়তে পড়তে মানুষের চিন্তা অন্য কোনদিকে চলে যাওয়া? আমাদের মধ্যে কে এমন আছে নামাযের মধ্যে যার চিন্তা অন্য দিকে যায় না? তিনি জবাব দেন, না এর মানে হচ্ছে নামাযের সময়টা নষ্ট করে দেয়া এবং গড়িমসি করে সময় শেষ হয় হয় এমন অবস্থায় তা পড়া। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, আবু ইয়া'লা, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস্ সুনান)

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, নামাযের মধ্যে অন্য চিন্তা এসে যাওয়া এক কথা এবং নামাযের প্রতি কখনো দৃষ্টি না দেয়া এবং নামায পড়তে পড়তে সবসময় অন্য বিষয় চিন্তা করতে থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রথম অবস্থাটি মানবিক দুর্বলতার স্বাভাবিক দাবি। ইচ্ছা ও সংকল্প ছাড়াই অন্যান্য চিন্তা এসে যায় এবং মু'মিন যখনই অনুভব করে, তার মন নামায থেকে অন্যদিকে চলে গেছে তখনই সে চেষ্টা করে আবার নামাযে মনোনিবেশ করে। দ্বিতীয় অবস্থাটি নামাযে গাফলতি করার পর্যায়ভুক্ত। কেননা এ অবস্থায় মানুষ শুধুমাত্র নামাযের ব্যায়াম করে। আল্লাহকে স্মরণ করার কোন ইচ্ছা তার মনে জাগে না। নামায শুরু করা থেকে নিয়ে সালাম ফেরা পর্যন্ত একটা মুহূর্তও তার মন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যেসব চিন্তা মাথায় পুরে সে নামাযে প্রবেশ করে তার মধ্যেই সবসময় ডুবে থাকে।

১০. এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে আবার পূর্বের বাক্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। একে স্বতন্ত্র বাক্য গণ্য করলে এর অর্থ হবে, কেননা সৎকাজও তারা আন্তরিক সংকল্প সহকারে আল্লাহর জন্য করে না। বরং যা কিছু করে অন্যদের দেখাবার জন্য করে। এভাবে তারা নিজেদের প্রশংসা শুনাতে চায়। তারা চায়, লোকেরা তাদের সৎ লোক মনে করে তাদের সৎকাজের ডংকা বাজাবে। এর মাধ্যমে তারা কোন না কোনভাবে দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করবে। আর আগের বাক্যের সাথে একে সম্পর্কিত মনে করলে এর অর্থ হবে তারা লোক দেখানো কাজ করে। সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ দ্বিতীয় অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ প্রথম নজরেই টের পাওয়া যায় আগের বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ "এখানে মোনাফিকদের কথা বলা হয়েছে,

যারা লোক দেখানো নামায পড়তো। অন্য লোক সামনে থাকলে নামায পড়তো এবং অন্য লোক না থাকলে পড়তো না।" অন্য একটি রেওয়ায়াতে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে," একাকী থাকলে পড়তো না। আর সর্ব সমক্ষে পড়ে নিতো।" (ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিশ শু'আব) কুরআন মজীদেও মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا –

"আর যখন তারা নামাযের জন্য ওঠে অবসাতগ্রস্তের ন্যায় ওঠে। লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে খুব কমই।" (আন নিসা ১৪২)

১১. মূলে মাউন (مـاعون) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আলী (রা), ইবনে উমর (রা), সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া, যাহ্হাক, ইবনে যায়েদ, ইকরামা, মুজাহিদ আতা ও যুহরী রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, এখানে এই শব্দটি থেকে যাকাত বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে মাসউদ (র) ইবরাহীম নাখয়ী (র) আবু মালেক (র) এবং অন্যান্য লোকদের উক্তি হচ্ছে, এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস–পত্র যেমন, হাড়ী–পাতিল, বালতী, দা,–কুড়াল, দাড়িপাল্লা, লবণ, পানি, আগুন, চকমাকি(বর্তমানে এর স্থান দখল করেছে দেয়াশলাই) ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। কারণ লোকেরা সাধারণত এগুলো দৈনন্দিন কাজের জন্য পরস্পরের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও মুজাহিদের একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়। হযরত আলীর (রা) এক উক্তিতেও বলা হয়েছে, এর অর্থ যাকাত হয় আবার ছোট ছোট নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রও হয়। ইবনে আবী হাতেম ইকরামা, থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, মাউনের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে যাকাত এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে কাউকে চালুনী, বালতী বা দেয়াশলাই ধার দেয়া। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহিসসাল্লামের সাথীরা বলতাম (কোন কোন হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক জামানায় বলতাম) ঃ মাউন বলতে হাঁড়ি, কুড়াল, বালতি, দাঁড়িপাল্লা এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস অন্যকে ধার দেয়া বুঝায়। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, আবু দাউদ, নাসায়ী, বায্যার, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান) সাঈদ ইবনে ইয়ায স্পষ্ট নাম উল্লেখ না করেই প্রায় এ একই বক্তব্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তার অর্থ হচ্ছে, তিনি বিভিন্ন সাহাবী থেকে একথা শুনেছেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শাইবা) দাইলামী, ইবনে আসাকির ও আবু নু'আইম হযরত আবু হুরাইরার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এ থেকে কুড়াল, বালতি এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস বুঝানো হয়েছে। এ হাদীসটি যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত এটি অন্য লোকেরা জানতেন না। জানলে এরপর কখনো তারা এর অন্য কোন ব্যাখ্যা করতেন না।

মূলত মাউন ছোট ও সামান্য পরিমাণ জিনিসকে বলা হয়। এমন ধরনের জিনিস যা লোকদের কোন কাজে লাগে বা এর থেকে তারা ফায়দা অর্জন করতে পারে। এ অর্থে যাকাতও মাউন। কারণ বিপুল পরিমাণ সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসেবে গরীবদের সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়। আর এই সংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং তাঁর সমমনা লোকেরা অন্যান্য যেসব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোও মাউন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, সাধারণত প্রতিবেশীরা একজন আর একজনের কাছ থেকে দৈনন্দিন যেসব জিনিস চেয়ে নিতে থাকে সেগুলোই মাউনের অন্তরভুক্ত। এ জিনিসগুলো অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া কোন আপমানজনক বিষয় নয়। কারণ ধনী–গরীব সবার এ জিনিসগুলো কোন না কোন সময় দরকার হয়। অবশ্যি এ ধরনের জিনিস অন্যকে দেবার ব্যাপারে কার্পণ্য করা হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। সাধারণত এ পর্যায়ের জিনিসগুলো অপরিবর্তিত থেকে যায় এবং প্রতিবেশীরা নিজেদের কাজে সেগুলো ব্যবহার করে, কাজ শেষ হয়ে গেলে অবিকৃত অবস্থায়ই তা ফেরত দেয়। কারো বাড়িতে মেহমান এলে প্রতিবেশীর কাছে খাটিয়া বা বিছানা–বালিশ চাওয়াও এ মাউনের অন্তরভুক্ত। অথবা নিজের প্রতিবেশীর চুলায় একটু রান্নাবান্না করে নেয়ার অনুমতি চাওয়া কিংবা কেউ কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে এবং নিজের কোন মূল্যবান জিনিস অন্যের কাছে হেফাজত সহকারে রাখতে চাওয়াও মাউনের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই এখানে আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, আখেরাত অস্বীকৃতি মানুষকে এতবেশী সংকীর্ণমনা করে দেয় যে, সে অন্যের জন্যে সামান্যতম ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি হয় না।